সাম্যবাদ বুলেটিন

বাসদ (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

৯ম বর্ষ, ০১ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০২৩ | web: www.spbm.org | মূল্য ২ টাকা

সংসদ ভেঙে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন ও

মূল্যবৃদ্ধিসহ জনজীবনের সংকট নিরসনে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

আরেকটি জাতীয় নির্বাচনের এখনো ১ বছর বাকি। কিন্তু এখনই আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশ একটা অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে চলেছে। জনমনে দেখা দিয়েছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর নানা আশঙ্কা। সরকার সমস্ত রকম বিরোধীমতকে নির্মমভাবে দমনের পথ বেছে নিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচিতে পুলিশ বাধা প্রদান করছে। নবাবপুর ও নিউমার্কেট এলাকায় স্বাক্ষর সংগ্রহ চলাকালে পুলিশের আচরণে সাধারণ মানুষও প্রতিবাদ করেছেন। সূত্রাপুরে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমাবেশে হামলা করেছে ছাত্রলীগ-যুবলীগ। এ হামলায় অনেকে আহত হয়। শুধু ঢাকাতেই নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের দলসহ বাম জোটের কর্মসূচিতে পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে, বাধা প্রদান করেছে।

বিএনপিসহ বিরোধী দলগুলোর সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান, পুলিশি হামলা, ভয়-ভীতি প্রদর্শন এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি ঘোষিত বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে পরিবহন ধর্মঘটের প্রহসন সৃষ্টি করা হয়েছে। বিএনপি'র ঢাকার সমাবেশের তিনদিন আগেই পুলিশ তাদের দলীয় কার্যালয়ে হামলা করেছে, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করেছে, গুলি করে একজনকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। সমাবেশের আগের দিন মধ্য রাতে দলের মহাসচিবসহ নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে। একটা গণতান্ত্রিক দেশে সভা-সমাবেশ করা নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সেই সাংবিধানিক অধিকারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার সম্পূর্ণ গায়ের জোরে দেশ শাসন করছে। পুলিশ, প্রশাসনসহ ছাত্রলীগ-যুবলীগকে সরকার এই কাজে লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। দেশের পুঁজিপতিশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য জনগণের সমস্তরকম গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদী স্বৈরতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেছে। আওয়ামী লীগ জানে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু হলেও আওয়ামী লীগের ভরাডুবি হবে। তাই বিগত দুটি নির্বাচনের মতো এবারও তারা একটি সাজানো নির্বাচন করে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করছে।

'মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি' বয়ানের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা দখলের বৈধতা তৈরির চেষ্টা

এই পরিস্থিতিতে জনমনে আশঙ্কা ভর করেছে সামনের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কী হতে যাচ্ছে? আবারও ২০১৪, ২০১৮ সালের পুনরাবৃত্তি হবে না তো? ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন ও ২০১৮ সালে পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় নৈশকালীন ভোটের মাধ্যমে প্রহসনের নির্বাচনের স্মৃতি দেশের জনগণের মন থেকে এখনো মুছে যায়নি। ২০১৪ সালের নির্বাচনী নাটকের প্রেক্ষাপট আওয়ামী লীগ আগেই তৈরি করেছিলো। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করেছিলো জনগণ, একে আওয়ামী লীগ সরকার একে তার ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে সে যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, তেমনি ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে সে বিচারের রায় প্রকাশ শুরু করে। যখন যেমন রায় প্রয়োজন সেভাবে সে রায় তৈরি করেছে। সরকারের এই অপকৌশলের বিরুদ্ধে শুরু হয় গণজাগরণ। যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে তৈরি এই জনমতকেও আওয়ামী লীগ সুচতুরভাবে কুক্ষিগত করে। প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিএনপি'র সাথে জামায়াতের আঁতাত, জঙ্গিবাদ-মৌলবাদের জুজু দেখিয়ে আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বনাম বিপক্ষের শক্তি – এই বিভক্তি তৈরি করে। দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও জনগণের একাংশকে এই প্রচারের মাধ্যমে তারা বিভ্রান্ত করে নিজেদের পক্ষে টেনে আনে এবং ২০১৪-র একতরফা নির্বাচন মেনে নেয়ার পক্ষে সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করে।

অনেকে এই বলে মত দেন, নির্বাচন যাই হোক – স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি তো ক্ষমতাসীন আছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়। আমরা সেদিনও বলেছিলাম, জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম চেতনাই ছিল গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত সর্বজনীন ভোটাধিকারের লেশমাত্র দেশে নেই। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অথচ ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করেছিলো। ফলে আওয়ামী লীগ কোন গণতান্ত্রিক শক্তি নয়।

আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক শক্তিও নয়। নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহারে আওয়ামী লীগ কারও থেকে পিছিয়ে নেই। ১৯৯৪ সালে জামায়াতের সাথে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ও বিএনপির পতনের জন্য আন্দোলন করেছে। ২০০৬ সালে খেলাফত মজলিসের সাথে নির্বাচনী চুক্তি করেছে। সেই চুক্তিতে ধর্মীয় নেতাদের ফতোয়া দেয়ার অধিকারসহ ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের কথাও ছিলো। জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের বিচারও আওয়ামী লীগ কোন আদর্শিক অবস্থান থেকে করেনি। আদর্শিক অবস্থান থাকলে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধের বিচারের দাবিতে গড়ে উঠা আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হতো না। বরং তখনই বিচারের আয়োজন করতো। ফলে এই বিচারের ন্যায্যতা থাকলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করা। বিগত কয়েক বছরে মৌলবাদী গোষ্ঠী হেফাজতে ইসলামকে পৃষ্ঠপোষকতা, তাদের দাবির মুখে পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রগতিশীল লেখকদের রচনা বাদ দেয়া, সাম্প্রদায়িক দলগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও আচরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করে না। বরং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে যা করতে হয় সে সবই করে।

আর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান আকাঙ্ক্ষা বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্বপ্ন তো স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগের হাতেই নিঃশেষ হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেশ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, ব্যবসায়ীদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেয়া হয়েছে, দেশের সম্পদ লুটপাট করে সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণি। আওয়ামী লীগের এই ১৪ বছরের শাসনে এক বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছে, অবাধে লুটপাট করেছে দেশের সম্পদ।

'উন্নয়নের গণতন্ত্র' স্লোগানে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ

অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের বৈধতা জাহির করতে আওয়ামী লীগ শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই ব্যবহার করছে না, উন্নয়নের স্লোগান তুলেও অসচেতন জনতাকে বিভ্রান্ত করছে। এই উন্নয়নের জন্যই নাকি সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগকেই ক্ষমতায় রাখা দরকার। ২০০৮ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ক্রমাগত আওয়ামী লীগ এই উন্নয়নের প্রচার চালিয়ে আসছে। তাদের স্লোগান– 'বেশি উন্নয়ন, কম গণতন্ত্র'। অর্থাৎ উন্নয়ন চাইলে গণতন্ত্রে ছাড় দিতে হবে। এই 'উন্নয়ন' জিনিসটা কী? একটা দেশের উন্নয়ন মানে দেশের জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসনসহ জীবনধারণের সকল অত্যাবশকীয় উপকরণের নিশ্চয়তা। এশিয়ার মধ্যে নেপালের পরেই সবচেয়ে খারাপ রাস্তা বাংলাদেশে। পৃথিবীর ১৮০টি দেশের মধ্যে পরিবেশ সূচকে আমাদের অবস্থান ১৭৯ তম, প্লাস্টিক দূষণে আমরা বিশ্বে দশম। দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা গার্মেন্টস শ্রমিকদের ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জনই ওভারটাইম করার পরও বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম মজুরি পান না, ১০ জনের মধ্যে নয়জনেরই তিনবেলা খাওয়ার সামর্থ্য নেই, ৮৭ শতাংশ পোশাক শ্রমিকই ঋণগ্রস্ত, ৫৬ শতাংশ পোশাক শ্রমিক বাকিতে জিনিস কিনতে বাধ্য হন। তাহলে উন্নয়ন কোথায়?

সরকার উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নকেই দেখাচ্ছে। উন্নয়ন মানে হলো পদ্মাসেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, আটলেন রাস্তা ইত্যাদি মেগা প্রজেক্ট। দৃশ্যমান এসব অবকাঠামোর সুবিধা হলো সহজেই এটা জনগণকে দেখানো যায়, জনমতকে প্রভাবিত করা যায়। এই কৌশল নতুন কিছু নয়। দেশে দেশে স্বৈরাচারী শাসকরা সবসময়ই এই কৌশল ব্যবহার করেছে। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব সরকার বা স্বাধীন দেশে সামরিক শাসক এরশাদের সময়ও এই জিনিস আমরা দেখেছি। আওয়ামী লীগ সরকারও তার ফ্যাসিবাদী শাসনের *২য় পৃষ্ঠায়*

১ম পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

পক্ষে জনসমর্থন তৈরির জন্য উন্নয়নের স্লোগান আমদানি করেছে। জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

উন্নয়নের নামে লুটপাট ও বৃহৎ পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় সৃষ্টি

উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এই উন্নয়ন যত হচ্ছে তত বন উজার হচ্ছে, পার্ক, সমুদ্র তীর, লেকসহ মানুষের চলাচল ও পরিভ্রমণের যতটুকু জায়গা ছিল তা ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাচ্ছে। লাগামহীন লুটপাট করে মুষ্ঠিমেয় একদল সুবিধাভোগী ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে। এই ধনিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থেই মেগা প্রজেক্টগুলো নেয়া হচ্ছে। মেগা প্রজেক্টের অর্থ দাঁড়িয়েছে মেগা লুটপাট। পদ্মাসেতু প্রকল্প ২০০৭ সালে অনুমোদনকালে ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০ হাজার ১৬২ কোটি টাকা। এর সর্বশেষ খরচ দাঁড়ায় ৩২ হাজার ৬৩৮ কোটি টাকা। মেট্রোরেল প্রকল্পের মূল ব্যয় ধরা হয়েছিল ২১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ১ কিলোমিটার বর্ধিত লাইনের জন্য প্রায় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশে কিলোওয়াট প্রতি ৫০০ থেকে ৪ হাজার ডলার পর্যন্ত বেশি ব্যয় হয়। সড়ক নির্মাণেও বাংলাদেশে ব্যয় সবচেয়ে বেশি। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রংপুর-হাটিকুমরুল চার লেন মহাসড়কের প্রতি কিলোমিটারে ৬৬ লাখ, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ৭০ লাখ, ঢাকা-মাওয়া মহাসড়কে ১ কোটি ৭০ লাখ ডলার ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে চার লেন সড়ক তৈরিতে ভারতে ১১ লাখ থেকে ১৩ লাখ ডলার ও চীনে ১৩ থেকে ১৬ লাখ ডলার খরচ হয়। এই উচ্চব্যয়ের কারণ উচ্চমাত্রায় দুর্নীতি। বিদ্যুৎ ক্রয় না করেও বসিয়ে বসিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে বিগত ১২ বছরে ৮৬ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ। ওয়াশিংটনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানসিয়াল ইন্টিগ্রিটি'র প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, গত ১৬ বছরে দেশ থেকে ১১ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এই সময়ে সোনালি ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারি, জনতা ব্যাংকের বিসমিল্লাহ গ্রুপ কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি, এস আলম গ্রুপের ইসলামী ব্যাংক কেলেঙ্কারিসহ ব্যাংক খাত থেকে ব্যাপক লুটপাট হয়েছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য, নির্মাণ, বিদ্যুৎ-জ্বালানি ও ব্যাংকসহ প্রায় সমস্ত খাতে নজিরবিহীন লুটপাট সংঘটিত হয়েছে। যার ফলাফলে ব্যাংকখাত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। রিজার্ভ ঘাটতিসহ সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি একটা সংকটের মধ্যে আছে। পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে মুনাফা লুণ্ঠন ছাড়াও এই লুটপাটের মাধ্যমে দেশে বিগত তিন দশকে একদল বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অতিধনী বৃদ্ধির হারে বিশ্বে প্রথম স্থানে বাংলাদেশ। প্রতিবছর গড়ে ৫ হাজার করে কোটিপতি বাড়ছে।

সরকারের জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ: মূল্যবৃদ্ধিতে জনগণের জীবনে নাভিশ্বাস

এই লুটপাটের ফলাফলে দেশে একদিকে যেমন ধনীদের সংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে দরিদ্রদের সংখ্যাও বাড়ছে। করোনাকালেই নতুন করে ৩ কোটি ২৪ লাখ মানুষ দরিদ্রের কাতারে নেমে গেছে। ধনী-গরীবের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য। মুষ্ঠিমেয় ধনী ও উচ্চবিত্তরা ছাড়া নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্তসহ সাধারণ মানুষের জীবন এখন সীমাহীন দুর্ভোগে নিপতিত। এই পরিস্থিতিতে সরকার জনগণকে সুরক্ষা দেয়ার বদলে এমন সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে যা চূড়ান্তভাবে জনস্বার্থবিরোধী। গ্যাস-বিদ্যুৎ, শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ সেবাখাতে ক্রমাগত ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছে, ভর্তুকি দিয়ে তার সরকার আর বেশিদিন চালাতে পারবে না। জনগণ যেন হারিকেন, কুপি জ্বালানোর প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন। সরকার একদিকে ভর্তুকি প্রত্যাহার করছে অন্যদিকে গ্যাস-বিদ্যুৎ জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করছে। এর ফলাফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। চাল-ডাল-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও সে অনুপাতে জনগণের আয় বাড়ছে না। ফলে প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কমছে। করোনা মহামারির পর ৭০ শতাংশ মানুষের আয় কমেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সংসার খরচ কমিয়েও কূল কিনারা করতে পারছে না দেশের মানুষ। ৪৩ শতাংশ পরিবার খাদ্য ব্যয় কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সঞ্চয় ভেঙে ধার দেনা করে কোনরকমে দিনাতিপাত করছে অনেক পরিবার। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অভাবের তাড়নায় এক মা তার সন্তানকে বিক্রি করতে বাজারে নিয়ে এসেছেন। বাস্তবে নীরবে একটা চাপা আর্তনাদ বয়ে বেড়াচ্ছে কোটি কোটি মানুষ। এ অবস্থায় সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষ। শ্রমজীবীরা ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত, কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করে নিরঙ্কুশ লুটপাট

বার বার গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, চাল-ডাল-তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠলেও ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট সাধারণ মানুষের পকেট থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতিনিয়ত লুটপাট করছে। এই বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার কাজটি আওয়ামী লীগ সরকার নিপুণভাবে করছে। আবার জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে যেন কোন বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারে সেজন্য সীমাহীন দমন-পীড়নের মাধ্যমে তথাকথিত স্থিতিশীল পরিবেশ অর্থাৎ কবরের শান্তি বজায় রাখতে পারছে আওয়ামী লীগ। তাই এই আওয়ামী লীগকে দিয়েই কথিত 'উন্নয়নে'র ধারা তথা লুটপাটের ধারা বজায় রাখা সম্ভব। সেজন্য বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আশীর্বাদ আওয়ামী লীগের পক্ষে। দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ী ও ভারত-চীনসহ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আনুকূল্যে সরকার জনমত ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতকে তোয়াক্কা করছে না। বিরোধী দলগুলোর সভা-সমাবেশের অধিকার সংকুচিত করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হামলা করছে। সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করতে তৈরি করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। ওটিটি প্লাটফর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও আইন তৈরি করা হয়েছে। সরকারের দমন-পীড়ন ও লুটপাট-দুর্নীতি, জীবনযাত্রার অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণে জনগণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে। আওয়ামী লীগ ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী বৃহৎ ব্যবসায়ীরাও এই সত্যটি জানে। আর জানে বলেই আপাত অর্থে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে জনগণের রায় পরীক্ষার সাহস তারা দেখাতে পারছে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাতিল করে গণআকাঙ্খার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া শ্রেণির অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বার বার ক্যু ও পাল্টা ক্যু সংঘটিত হয়েছে। এসেছে একের পর এক সামরিক শাসন। নব্বই এর গণআন্দোলনের পথ ধরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলগুলোও সে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে জনগণের সমর্থন আদায় করেছিল। কিন্তু এরপর আওয়ামী লীগ-বিএনপি যারাই ক্ষমতায় এসেছে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এরশাদ পতনের পর সাংবিধানিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা এসেছিলো। কিন্তু পরবর্তী বিএনপি সরকারের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি এসেছে সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতা থেকে। বিএনপি অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিলো। ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত মাগুরা উপনির্বাচনের নমুনা দেখে জনগণ বুঝতে পেরেছিলো দলীয় সরকারের অধীনে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনও সম্ভব নয়। তখন গণআন্দোলনের চাপে বিএনপি সরকার সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে যুক্ত করতে বাধ্য হয়। সেদিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলো আওয়ামী লীগ। অথচ ক্ষমতায় এসে অগণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে বাতিল করেছে। জনগণের আকাঙ্খার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখন আওয়ামী লীগ যুক্তি করছে – তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে নেই, তাই সে ব্যাপারে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না। জনআকাঙ্খার ভিত্তিতে সংবিধানে যুক্ত করা বিধান আওয়ামী লীগ অগণতান্ত্রিকভাবে বাতিল করেছে। তার উচিত জনআকাঙ্খাকে সম্মান জানিয়ে সেই বিধান আবার যুক্ত করা।

দলীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়েছে

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রশাসন– রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তম্ভের পারস্পরিক প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার ধারণা বুর্জোয়ারাই এনেছিলো। এনেছিলো বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য আনার জন্য। এই ধারণা থেকেই পরবর্তীতে নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক সাংবিধানিক পদও সৃষ্টি করা হয়েছে (যেমন নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন)। কিন্তু বাংলাদেশের বুর্জোয়া শাসকরা কোনদিনই এই গণতান্ত্রিক কাঠামো কার্যকর করেনি।

সংবিধানের নির্দেশনা অনুসারে বিচার বিভাগ স্বাধীন করার কথা থাকলেও কোন সরকারই তা করেনি। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ১৯৯৪ সালে একটি রিট হয়, যার রায় প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। 'মাসদার হোসেন' মামলা বলে পরিচিত এ রায়ে সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে ১২ দফা নির্দেশনা দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ-বিএনপি কেউ-ই তা কার্যকর করেনি। ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিচার বিভাগকে আলাদা করার ঘোষণা দিলেও বাস্তবে তা কাগজ কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ফলে বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি এখনও সরকারের হাতে। এর মাধ্যমে সরকার খুব সহজেই বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন আইন নেই। এ কারণে যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে অবলীলায় তারা তাদের পছন্দের ব্যক্তিদের বিচারক নিযুক্ত করতে পারে। নিয়োগপ্রাপ্তরাও দলীয় আনুগত্য পোষণ করেন। স্বাধীন করা তো দূরের কথা বরং ২০১৭ সালে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (শৃঙ্খলা) বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ বিচারক ও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর আরও বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এর সূত্র ধরেই তৎকালীন প্রধান বিচারপতির সাথে সরকারের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। এক পর্যায়ে ষোড়শ সংশোধনী বাতিল ঘোষণা করলে বিরোধ চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। সরকার তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহাকে পদত্যাগে, এমনকি দেশত্যাগে পর্যন্ত বাধ্য করে। প্রধান বিচারপতি প্রবাসে অবস্থানকালীন এক সাক্ষাৎকারে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "যে দেশে প্রধান বিচারপতি বিচার পায় না, সেদেশে সাধারণ মানুষ কিভাবে বিচার পাবে?"

এই হলো আমাদের বিচার বিভাগের অবস্থা! আইন বিভাগ অর্থাৎ সংসদ অনির্বাচিত ও অবৈধ। ফলে অবৈধ এ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য এই সংসদ একের পর এক নিবর্তনমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তন করছে। প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে তারা এখন আর গোপন সমর্থক নন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা খোলামেলাভাবে দলীয় বক্তব্য দিচ্ছেন। ফলে আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করেছে।

নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও সংবিধানের অগণতান্ত্রিক বিধান বাতিল করতে হবে

অনেকে বলে থাকেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকেও তো প্রভাবিত করা যায়। অতীতে পছন্দের ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার জন্য আইন পরিবর্তনেরও নজির রয়েছে। তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এই মডেল এখনো তার প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা হারায়নি। নির্বাচন কমিশন ও সাংবিধানিক পদগুলোতে নিয়োগসহ সংবিধানের গণতান্ত্রিক সংস্কার করতে হবে। আপেক্ষিক অর্থে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন অথচ স্বাধীনতার ৫০ বছরেও কোন সরকার এই কাজ করেনি। অনেক দাবির মুখেও নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়ন করেনি। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সরকার তার কাজকে বৈধতা দিতে কারো কোন মতামত না নিয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় তাড়াহুড়ো করে একটি নির্বাচন কমিশন আইন করেছে। কিন্তু এতে বর্তমান অবস্থার কোন হেরফের হবে না। কারণ আইন প্রণয়নের পূর্বেই এই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে আওয়ামী লীগের পছন্দের ভিত্তিতেই। সার্চ কমিটির কাছে আওয়ামী লীগ তার প্রস্তাবনা অনুগত দলগুলোর মাধ্যমে উপস্থাপন করে। পরবর্তীতে সার্চ কমিটির প্রস্তাবের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হলে তারা দেখায় যে এটি নিরপেক্ষ, কারণ তাদের প্রস্তাবিত লোককে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়নি। এই ধরনের নোংরা চালবাজির নির্বাচন থেকে আপেক্ষিকভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে যেতে হলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন ও গোটা নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। তাছাড়া সবকিছুই হবে প্রহসন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ৭১-সালে এদেশের মানুষ বুকের রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিল একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য। একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংবিধানই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রচিত সংবিধান শেষ বিচারে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বার্থরক্ষক হিসেবেই কাজ করে। কিন্তু তা হলেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চৌহদ্দির মধ্যেই সে নাগরিকদের কিছু গণতান্ত্রিক অধিকারের অঙ্গীকার করে, যা এই বুর্জোয়ারাই একদিন লড়াই করেই অর্জন করেছিল। কালক্রমে সেই অধিকারগুলো যখন বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন সে তা নির্মমভাবে কেড়ে নিচ্ছে। এই সময়ে বুর্জোয়ারা, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি শ্রেণি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই করবে না। করলেও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য করবে, ক্ষমতায় যাওয়ার পর ভুলে যাবে। নব্বইয়ের এরশাদবিরোধী আন্দোলনে গণতান্ত্রিক সংস্কারের এই দাবিগুলো উঠেছিল। সেসময় আন্দোলনরত

৩য় পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ
৯ম বর্ষ, ০১ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০২৩

২য় পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

তিন জোটের রূপরেখায় তা ঘোষিতও হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা এইসব প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিকভাবে বিকশিত হতে তো দেয়ইনি উল্টো দলীয়করণের মাধ্যমে ক্রমাগত দুর্বল করেছে। দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে। নষ্ট করেছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। ফলে আমাদের দেশের আওয়ামী লীগ-বিএনপির মতো বড় বড় বুর্জোয়া দলগুলোকে দেখি যে, তারা ক্ষমতার বাইরে থাকলে গণতান্ত্রিক, ক্ষমতায় গেলে স্বৈরাচারী। ফলে আজকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই সংগ্রামে বামপন্থীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন বিশ্ব পুঁজিবাদের ক্ষুয়িষ্ণু যুগ। আন্তর্জাতিকভাবে বুর্জোয়ারা তখন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে এদেশের বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হওয়ায় তার মধ্যে অনেক দুর্বলতা থেকে গিয়েছিলো। বুর্জোয়া শ্রেণির এই দুর্বলতা নিয়েই দেশ স্বাধীন হয়েছিলো। ফলে স্বাধীনতার পর যখন তাদের নেতৃত্বে সংবিধান রচিত হয় তাতে বুর্জোয়া অর্থেও যে পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক বিধান থাকার কথা তার অনেককিছুই ছিল অনুপস্থিত। যেমন, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদের জবাবদিহিতা থাকবে সংসদের কাছে। কিন্তু সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে সংসদ সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। এ কারণে সংসদ সদস্যদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে স্বাধীনভাবে মতামত দেয়ার সুযোগ নেই। এটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শুধু ৭০ অনুচ্ছেদ নয়, গোটা প্রশাসনিক প্রক্রিয়াতে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ, রাষ্ট্রপতি পদটি বাস্তবে আলংকারিক। তার কোন ক্ষমতা নেই। ফলে প্রধানমন্ত্রীর হাতে সংবিধান প্রদত্ত নির্বাহী ক্ষমতা, সরকারিদলের সংসদীয় নেতা হিসেবে সংসদীয় ক্ষমতা, দলীয় প্রধান হিসেবে দলের ক্ষমতা – এই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হলে গণতান্ত্রিক চর্চা ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সংবিধানের সমস্ত কালাকানুন বাতিল করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য স্থাপন করা প্রয়োজন।

নির্বাচনে জনগণ যেন অবাধে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সেজন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করাও অপরিহার্য। নির্বাচনে সকল নাগরিক যেন প্রতিযোগিতা বা প্রতিনিধিত্ব করার সমান সুযোগ পায় সেজন্য জামানতের পরিমাণ ও নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা (২৫ লক্ষ টাকা) কমাতে হবে। যদিও বাস্তবে আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ বড় দলগুলো এই সীমা কখনই মানেনি। তারা শত শত কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচনকে টাকার খেলায় পরিণত করেছে। পেশি শক্তি, টাকার ব্যবহার, সাম্প্রদায়িকতা-আঞ্চলিকতার উস্কানি ইত্যাদি নির্বাচনী ব্যবস্থা ও জনমতকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনকে এসবের প্রভাবের বাইরে রাখতে হলে বর্তমান এলাকাভিত্তিক আসন ব্যবস্থার নির্বাচন পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এর ফলে যে দল নির্বাচনে যত শতাংশ ভোট পাবে – প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে সংসদে ততগুলো আসন তারা পাবে। বর্তমান ব্যবস্থায় দেখা যায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে কোন দল সরকার গঠন করছে। বিপরীতে এলাকাভিত্তিক আসনে হেরে যাওয়ায় তাদের যে জনগণ সমর্থন করছে সেই জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব সংসদে থাকে না। তাই প্রত্যেক দলকে যত শতাংশ জনগণ সমর্থন করছে বা ভোট দিচ্ছে সেই অনুসারে আসন বন্টন হলে বা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন হলে সংসদে জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন ঘটবে। এভাবে পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ঢেলে না সাজালে একদিনের একটি নির্বাচনে জনগণ যে অবাধে ভোট দেবে তার পরিবেশও নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বামজোট ও আমাদের দল গণতান্ত্রিক দাবিগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে লড়ছে

সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ২য় ও ৮ম সংশোধনীসহ সংবিধানের স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, জাতিসত্ত্বাবিরোধী সকল বিধান বাতিল ও সংবিধানের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত, সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে সাংবিধানিক পদে নিয়োগ, ৫৪ ধারা, ৫৭ ধারা, তথ্য প্রযুক্তি আইন, জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, নিবর্তনমূলক ও অগণতান্ত্রিক সকল আইন ও সার্বজনীন মৌলিক অধিকারপরিপন্থী সকল কানুন বাতিল, জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং স্বাধীন ও আর্থিক ক্ষমতা সম্পন্ন নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক পদ্ধতি বাতিলের দাবিসহ আন্দোলনের আশু ৫ দফা দাবি আমাদের দলসহ তৎকালীন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা ও সিপিবি-বাসদ যৌথভাবে ১ আগস্ট ২০১৭ সালে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরে। একই বছরের ৫ আগস্ট বাম গণতান্ত্রিক জোট 'ভোটাধিকার নিশ্চিত এবং বিদ্যমান নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাবনা' শীর্ষক মত বিনিময় সভার মাধ্যমেও এই বক্তব্যগুলো তুলে ধরে। ফলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আজ সংস্কারের যে দাবিসমূহ উঠছে তা নতুন কিছু নয়। এই দাবিগুলো আমরা করিনি তাও নয়। এই দাবি আদায়ের পরিপূরক রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলায় যথাযথ উদ্যোগের ঘাটতি থাকতে পারে। বর্তমানে তাই দাবি আদায়ে উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তি সমাবেশ ও আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

একই সাথে আমাদের এও মনে রাখতে হবে, একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আপেক্ষিক অর্থে যত সুষ্ঠু নির্বাচনই হোক না কেন তার মধ্যে মানি, মিডিয়া ও মাসল পাওয়ার এর ব্যবহার থাকেই। মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের মতামতকে প্রভাবিত করে এবং অর্থ ও পেশি শক্তির মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে পুঁজিপতিশ্রেণি নিজেদের পছন্দের শাসককে নির্বাচনে জিতিয়ে আনে। তাই নির্বাচনের মাধ্যমে যারা ক্ষমতাসীন হয় তারা পুঁজিপতিদের স্বার্থেই কাজ করে শেষ পর্যন্ত। রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনগণ এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে মাত্র। ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করেও কাঙ্খিত পরিবর্তন দেখতে পায় না। ফলে আবার হতাশ হয়। কারণ রাজনৈতিক সচেতনতার অভাবে তারা এটা ধরতে পারে না যে ভোটে সরকার পরিবর্তন হলেও সমাজে চলমান শোষণ বৈষম্যের উৎস পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না। এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এই দলগুলো কাজ করে। ফলে নির্বাচনী মোহ থেকেও জনগণকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক চেতনার দ্বারা যতদিন না এটা সম্ভব হয় ততদিন এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ন্যূনতম যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো আছে তার জন্য লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন আছে আবার হতাশাও আছে – এত লড়াই, এত রক্তক্ষয় করে কী লাভ? এই তো পরিণতি! আন্দোলন করে তো স্বৈরাচার এরশাদকেও আমরা হঠালাম। তাতে কী লাভ হলো? আরেকটা সুষ্ঠু নির্বাচন হলেই কি মানুষের মুক্তি মিলবে? একথা ঠিক একটা নির্বাচন হলেই দেশের জনগণের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। নির্বাচন সব সমস্যার সমাধান তো নয়ই। জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি তথা সর্বপ্রকার শোষণ বৈষম্য থেকে মুক্তির চূড়ান্ত পথ সমাজ পরিবর্তন। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপ্লবের আঘাতে পরাস্ত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সে মুক্তি আসবে না। কিন্তু যখন শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয় তখন তাকে রক্ষার সংগ্রাম অপরিহার্য। এই গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লড়াই চূড়ান্ত মুক্তির লড়াইয়েরই পরিপূরক। ফলে সুষ্ঠু নির্বাচন ও আন্দোলন নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশার যে চিত্র আজ আমরা দেখছি তা প্রশ্নের একটি দিক। এর আরেকটি দিকও আছে। আপাত এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইতিহাসে এও তো সত্য যে, আন্দোলন ছাড়া শাসকশ্রেণি জনগণকে কোন অধিকার দেয় না। সে রাজনৈতিক অধিকার হউক, কিংবা অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকার হোক; জনগণকে আন্দোলন করেই তা অর্জন করতে হয়। আমাদের দেশের ইতিহাসেই এর অনেক নজির আছে। আন্দোলনের চাপেই শাসক বুর্জোয়ারা নতি স্বীকার করে কিছু দাবি দাওয়া মানতে বাধ্য হয়। আবার আন্দোলনের মাধ্যমে একদা অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার সুযোগ পেলে বুর্জোয়ারা আবার ছিনিয়ে নিতে চায়। তাই অধিকার অর্জনই শুধু নয়, অধিকার রক্ষা করতে হলেও গণআন্দোলনের শক্তি তথা জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে হবে। পুঁজিবাদী সমাজে গণআন্দোলনই জনগণের অধিকার আদায় ও রক্ষার একমাত্র গ্যারান্টি। তাই দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিও আন্দোলন ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। এই দাবি আদায়ের জন্য সমস্ত শক্তি দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলাই শ্রমিকশ্রেণির দল হিসেবে আমাদের ও জনগণের এই সময়ের কর্তব্য।

বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের আন্দোলন প্রসঙ্গে

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দেশে যে জগদ্দল পাথরের মতো ফ্যাসিবাদী শাসন জারি রেখেছে তার বিরুদ্ধে আন্দালন গড়ে তোলা ও এই ফ্যাসিবাদী সরকারকে উচ্ছেদ করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এ সময়ের প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য। কিন্তু এই ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যারা কথা বলছে, আন্দোলনের আওয়াজ তুলছে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র বিচার করে ও সঠিক রাজনৈতিক শক্তির নেতৃত্বে আন্দোলনে শামিল না হলে কাঙ্খিত ফলাফল আসবে না। ফলে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন যেমন গড়ে তুলতে হবে তেমনি আন্দোলনের ময়দানে ক্রিয়াশীল দলগুলোর রাজনৈতিক চরিত্র বিচারের কাজটিও একই সাথে করতে হবে। না হলে জনতার রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্মলাভও সম্ভব হবে না। আশু ফল লাভের জন্য আদর্শগত এই আন্দোলন এড়িয়ে যাওয়া হবে সুবিধাবাদিতারই নামান্তর। দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাসিবাদী শাসনের যাতাকলে পিষ্ট দেশে সত্যিকারের গণআন্দোলনের অনুপস্থিতি ও এই আন্দোলন গড়ে তোলার দায়িত্ব যাদের সবচেয়ে বেশি সেই বামপন্থীদের আদর্শিক-রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে ফ্যাসিবাদী শাসনে অতিষ্ঠ জনগণ আওয়ামী লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ মন থেকে আজ বিএনপির দিকে ঝুঁকছে। বিএনপির কর্মী-সমর্থক বাদ দিলে জনগণের যে বিরাট অংশের সমর্থন তাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে তা যতটা না বিএনপির রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে, তারচেয়ে বেশি আওয়ামী লীগের প্রতি বিরক্তি-বিক্ষুব্ধতা থেকে। এটা হতে পারলো এই কারণে যে এদেশের বামপন্থীরা জনগণের কাঙ্খিত রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ করতে পারেনি। এই দুর্বলতা সত্ত্বেও দেশের জনগণকে ভাবতে হবে, আওয়ামী লীগের দমন-পীড়নকে বিএনপি আজ যতই ফ্যাসিবাদী শাসন হিসেবে আখ্যা দিক, ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপিও একই কাজ করেছে। যদিও মাত্রাগত কিছু তারতম্য আছে। বিরোধী রাজনীতি নির্মূলের চেষ্টা তারাও করেছে। ফলে আজ আওয়ামী লীগের নিপীড়নের মুখে পড়ে আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদী বললেও একই প্রবণতা ও চরিত্র তাদের মধ্যেও বিদ্যমান। কারণ ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের কালে কোন বুর্জোয়া দলই আর গণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করতে পারে না। শ্রেণিগত স্বার্থের কারণেই পারে না। বুর্জোয়া শ্রেণির এটা ঐতিহাসিক ও চরিত্রগত সীমাবদ্ধতা। তাই ক্ষমতার বাইরে থাকলে তার গণতান্ত্রিক চেহারা থাকে। আর ক্ষমতায় গেলে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে তার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ে। ক্ষমতার বাইরে থাকলে জনসমর্থন আদায় করার জন্য, জনগণের মধ্যে ক্ষমতাসীন সরকারবিরোধী মনোভাবকে পুঁজি করার জন্য সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি দেয়। বিএনপি আজ একই কাজ করছে। তাদের ১০ দফা দাবিনামা ও রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখার ২৭ দফা প্রস্তাবনা এরকমই প্রতিশ্রুতিতে ভরপুর। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না একই রকম প্রতিশ্রুতি নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময়ও তারা দিয়েছিল। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি তারা রাখেনি। রাখা না রাখাটা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, তাদের শ্রেণিগত অবস্থানই এই প্রতিশ্রুতি তাদের পূরণ করতে দেবে না। তাই বিএনপির নেতৃত্বে আজ যারা রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের স্বপ্ন দেখছেন তাদের এই খোয়াব অপূর্ণই থেকে যাবে। কারণ যে কোন আন্দোলনের ফলাফল নির্ভর করে আন্দোলনের নেতৃত্ব কেমন তার উপর। 'ক্ষমতাকাঠামো'র ভাগাভাগিতে তাদের কিছু জুটলে জুটতেও পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের কাম্য পরিবর্তন কতটুকু হবে তা সময়ই বলে দেবে।

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্র মঞ্চ' নামে সাতটি রাজনৈতিক দলের জোট হয়েছে সম্প্রতি। তারাও ইতোমধ্যে রাষ্ট্র সংস্কারের ১৪ দফা প্রস্তবনা দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের বর্তমান ফ্যাসিবাদী শাসনকে তারা যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু চিহ্নিত করাটাই যথেষ্ট নয়। রোগ নির্মূলের জন্য রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করা জরুরি। তারা যদি এই ফ্যাসিবাদকে সত্যিকারভাবে নির্মূল করতে চান তাহলে তো এই ফ্যাসিবাদের উৎসও সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তা না হলে লড়াইয়ের নাম করে তারা জনতাকে ভুল পথে পরিচালিত করবেন। আমাদের গণতন্ত্র মঞ্চের বন্ধুরা আওয়ামী ফ্যাসিবাদের উৎস হিসেবে শুধু সংবিধানকে দেখছেন। একথা ঠিক যে, দেশের বর্তমান সংবিধানে যেভাবে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুকূল নয়। শুধু তাই নয়, এই সংবিধানে অনেক অগণতান্ত্রিক বিধান আছে – যে বিষয়ে আমরা আগেই বলেছি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সেগুলোর সংস্কার জরুরি। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে– সংবিধান, আইন, রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইত্যাদি একটা উপরিকাঠামো। তার ভিত্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবেই উপরিকাঠামো অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি হয়। যে গণতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে তা হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র। আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই উপরিকাঠামো।

আমাদের দেশে বর্তমানে বৃহৎ

শেষ পৃষ্ঠায়

সাম্যবাদ বুলেটিন
বাসদ (মার্কসবাদী)'র মুখপত্র

শেষ পৃষ্ঠা
৯ম বর্ষ, ০১ সংখ্যা, প্রকাশকাল: জানুয়ারী ২০২৩

৫ দফা দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র স্বাক্ষর সংগ্রহ

পুলিশের বাধা, জনগণের বিপুল সমর্থন

আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)'র স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। স্বাক্ষর সংগ্রহে মানুষের সাড়া অভূতপূর্ব। গোটা দেশের বেশিরভাগ মানুষই এই রাজনৈতিক দাবির ব্যাপারে একমত। আরেকটা নির্বাচনী নাটক তারা দেখতে চান না।

জনগণ স্বতস্ফুর্তভাবে কোন কর্মসূচীকে সমর্থন করলে সেখানে পুলিশ কিংবা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী বাধা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। স্বাক্ষর সংগ্রহ চলাকালে দৈনিক বাংলা, মতিঝিল, নিউ মার্কেটে পুলিশ বাধা দেয়। পথচারী সাধারণ জনগণ এর প্রতিবাদ করেন।

আগামী মার্চ পর্যন্ত এই স্বাক্ষর সংগ্রহ চলবে। আগামী ৫ এপ্রিল সংগৃহিত স্বাক্ষরসহ রাষ্ট্রপতি বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

দাবিসমূহ:

১. অবিলম্বে সংসদ ভেঙে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাও। নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু কর।

২. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি রোধ কর। সর্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা চালু কর। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু কর।

৩. শ্রমিকদের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা কর। সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় কর। কৃষি ঋণ মওকুফ কর, কৃষি খাতে ভর্তুকি বাড়াও।

৪. শিক্ষা, চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসা বন্ধ কর। স্নাতক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু কর। সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত কর।

৫. অব্যাহত নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, হত্যা বন্ধ কর।

৩য় পৃষ্ঠার পর

গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

পুঁজিপতি গোষ্ঠীর প্রয়োজনেই দ্বিদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় সংসদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুর্জোয়ারা কখন কোন ধরনের ব্যবস্থায় দেশ পরিচালনা করবে তা নির্ভর করে তাদের শ্রেণিগত প্রয়োজন ও ঐ নির্দিষ্ট দেশের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ভারসাম্যের উপর। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শক্তির উপস্থিতি ফ্যাসিবাদী শাসনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তার ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি কমাতে পারে, কিন্তু তাকে নির্মূল করতে পারে না। ফ্যাসিবাদের উৎস বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। শুধু সংবিধান সংশোধন বা উপর উপর কিছু পরিবর্তন নয় – সত্যিকারভাবে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করতে হলে, চিরতরে নির্মূল করতে হলে ফ্যাসিবাদের উৎস যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, তাকে উচ্ছেদের সংগ্রামের সঙ্গে ফ্যাসিবাদবিরোধী লড়াইকে যুক্ত করতে হবে। না হলে এত লড়াই, এত রক্তদান সবই বৃথা হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না

বর্তমান ফ্যাসিবাদী সরকার জনগণের উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় টিকে নেই। এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট। তার ক্ষমতার নিরঙ্কুশ উৎস দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের আশীর্বাদ। আজকের দিনে কোন একটা পুঁজিবাদী দেশ বিশ্ব পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই স্বভাবতই এদেশের পুঁজিপতিদের সাথেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পুঁজিপতিদের গভীর সংযোগ আছে। তারা পরস্পর স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই এই ফ্যাসিবাদী সরকারের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ বিশেষত ভারত-চীন-রাশিয়ার আনুকূল্য আছে। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রতিদিনই এদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, গুম-খুন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ নিয়ে বিবৃতি দিচ্ছে। এটা দেখে অনেকেই মনে করছেন যে আমেরিকা হয়তো দেশে গণতন্ত্র এনে দেবে। গণতন্ত্রের জন্যই কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যত উদ্বেগ? এই প্রশ্নটি আমাদের ভাবতে হবে। যদি তাই হতো তাহলে ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার আজকের এই পরিণতি হত না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বর্তমান সরকারের দূরত্ব তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী পরিমণ্ডলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এখন চীন। বাংলাদেশের সরকার যখন ক্রমাগত চীনের দিকে ঝুঁকছে– সেই দ্বন্দ্ব থেকেই আমেরিকার এই অবস্থান। এটা স্বার্থের দরকষাকষি মাত্র। আধিপত্য বিস্তারের সুবিধার্থে ভূকৌশলগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ আমেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ যেন পুরোপুরি চীনের দিকে ঝুঁকে না যায় সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে চাপে রাখার কৌশল হিসেবে এই হুমকিগুলো দেয়। আরেকদিকে বিএনপি, গণঅধিকার পরিষদসহ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা রত বলে মনে করেন তারাও দেশকে গভীরভাবে সাম্রাজ্যবাদী চক্রে আবদ্ধ করছেন। আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী শাসন যেমন এদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করেছে, দেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে তেমনি ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে আরেকদল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আনুকূল্য লাভের আশায় দূতাবাসে দূতাবাসে দৌড়াচ্ছেন। এটিও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত করছে। দেশে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করতে হবে। বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে দেশের জাতীয় স্বার্থ তথা জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের সমর্থনের উপরই মূলত নির্ভর করে। এভাবে দেশকে আরো গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দেয়, যা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির পরিচায়ক নয়।

বিপ্লবী বামপন্থার শক্তি বৃদ্ধি করে বাম গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সত্যিকারের গণআন্দোলন গড়ে তোলার নির্ভরযোগ্য শক্তি শ্রমিকশ্রেণি তথা বাম গণতান্ত্রিক শক্তি। যদিও বামপন্থী আন্দোলন নানা দুর্বলতা নিয়ে অবস্থান করছে। সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তি সামর্থ্য নিয়ে উপস্থিত নেই। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য বা সর্বাত্মক বাম ঐক্য গড়ে তোলা দরকার। বামপন্থী দলসমূহের মধ্যে নির্বাচনী ঝোঁক ও উগ্র বামপন্থী ঝোঁক – এই দুইরকম প্রবণতা বিদ্যমান। যা ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাঁধা তৈরি করছে। অন্যদিকে বাম গণতান্ত্রিক জোট, আমাদের দলও যে জোটের অংশীদার, জোটের শরীক সংগঠন হিসেবে আত্মসমালোচনা হিসেবেই আমরা বলছি– এই জোট থেকে আমরা সঠিক দাবিগুলো বিভিন্ন সময়ে তুলতে পেরেছি, কিন্তু ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের আস্থার শক্তি হিসেবে আমরা গড়ে উঠতে পারিনি। বামপন্থী দলগুলোর ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় একটা মোর্চায় ঐক্যবদ্ধ করতে পারলেও অন্যান্য শ্রেণি ও গণসংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়নি। সমস্ত শ্রেণি-পেশার সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় এনে দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে তা দলগুলোর রাজনৈতিক সংগ্রামকেও বিকশিত হতে সাহায্য করতো। বিশেষত বর্তমান সংগ্রামে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাও সংগ্রামেও শ্রেণিভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আন্দোলনে বামপন্থীদের নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠা বা প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণি ও গণসংগঠনগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন আবশ্যক।

বর্তমানে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর গণআন্দোলণ ও জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দলের শক্তি বৃদ্ধি অপরিহার্য। সত্যিকারের বিপ্লবী দল বামপন্থীদের আন্দোলনকে প্রভাবিত করার মত উপযুক্ত শক্তি সামর্থ্য নিয়ে উপস্থিত না হলে শক্তিশালী বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যাশাও পূরণ হবে না। তাই দেশে রাজনীতি সচেতন ও গণতন্ত্রকামী সকল মানুষের কাছে আমাদের আবেদন – যারা সত্যি চলমান ফ্যাসিবাদের শাসনের অবসান, ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে চান তাদের বিপ্লবী বামপন্থার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এই প্রক্রিয়াতেই কেবল সামগ্রিক বামপন্থী আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হবে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাম গণতান্ত্রিক জোটের নেতৃত্বে এই গণআন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে জনতার কাঙ্খিত মুক্তি আসবে না।

সম্পাদক : জয়দীপ ভট্টাচার্য, বাসদ (মার্কসবাদী)'র পক্ষে শফিউদ্দিন কবির আবিদ কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন-০২-২২৩৩৫৬৩৭৩। website: www.spbm.org, e-mail: mail@spbm.org